এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু যৌন নির্যাতন ও প্রতিরোধ

ফারজানা রশীদ চৌধুরী
কাউন্সেলর
ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

শিশুরা বড়দের বিশ্বাস করে। বড়রা শিশুদের উপর কর্তৃত্ব করেন। 'শিশু যৌন নির্যাতন' বলতে বোঝায় বয়স্ক কেউ যখন শিশুর এই বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে এবং শিশুর উপর কর্তৃত্বের দ্বারা শিশুটিকে কোন রকম যৌন কার্যে নিয়োজিত করে। Finkelhor & Korbin (1988) এর মতে, কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক/শিশুর যৌন ক্রিয়াকে শিশু যৌন নির্যাতন বোঝায়।

যে কোন বয়সের শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তবে ৮-১২ এ বয়সের যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। Finkelhor & Hotaling (1990) তিনি গবেষণায় দেখতে পান যে, ১৮ বছরের নীচে প্রতি ৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে এক জন মেয়ে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং প্রতি ৬ জন ছেলে শিশুর মধ্যে একজন ছেলে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

শিশুরা সাধারণতঃ যেধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, সেগুলো হলো:

- শিশুকে উলংগ করে দেখে যৌন তৃপ্তি লাভ করা।
- শিশুকে যৌনাংগ দেখিয়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা।
- শিশুকে অশ্লীল চিত্র দেখিয়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা।
- যৌন মনোভাব নিয়ে শিশুকে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা।
- শিশুর স্তনে হাত বুলিয়ে আদর করা।
- শিশুর যৌনাংগে হাত বুলানো।
- শিশুকে দিয়ে হস্তমৈথুন করানো বা শিশুকে দেখিয়ে হস্তমৈথুন করা।
- শিশুর মুখ দ্বারা যৌন কার্য সম্পন্ন করা।
- শিশুর পায়ুদ্বারে বা যোনীদ্বারে পুংলিঙ্গ, আঙ্গুল বা অন্য কোন জিনিস ঢোকানো।
- শিশুকে অশ্লীল চিত্রে ব্যবহার বা বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা, ইত্যাদি।

একজন শিশু যৌন নির্যাতনকারী যে কেউ হতে পারে – পরিবারের লোক, পরিবারের ঘনিষ্ট আত্মীয়, পরিচিত শুভাকাঙ্খীদের কেউ এবং অপরিচিত। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে অপরিচিতদের চাইতে পরিচিতরাই বেশি শিশু যৌন নির্যাতন করে। কারণ, পরিচিতরাই বেশি নির্যাতন করার সুযোগ পায়। পরিচিত পরিবেশে এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিভাবক সাবধান থাকার প্রয়োজন মনে করে না। আর পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি কেউ নির্যাতনকারী থাকে সেই নির্যাতনকারী অভিভাবকের অবহেলার কারণে শিশুর কাছে আসার সুযোগ পায়। পরিচিত হওয়ার কারণে নির্যাতনকারী শিশুর সাথে কর্তৃত্বমূলক সম্পর্ক তৈরির সুযোগ পায়। উপরন্তু, নির্যাতনকারী আত্মীয় হলে শিশু নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেনা।

নির্যাতনকারী নির্যাতন করার জন্য সাধারনত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন: নির্যাতনকারী শিশুকে বিভিন্নভাবে লোভ দেখাতে পারে। যেমন : চকলেট, চিপস, আইসক্রিম ইত্যাদি বা শিশুর পছন্দের কোন কিছু উপহার দিয়ে, পরীক্ষায় বেশী নম্বর দেয়ার কথা বলে, বাসাবাড়িতে যেসব শিশুরা কাজ করে তাদের টাকা, প্রসাধন সামগ্রি উপহার দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, তেল পড়া দেয়ার কথা বলে শিশুর যৌনাঙ্গে তেল মালিশ করে, লুকোচুরি খেলার ছলে শিশুকে জড়িয়ে ধরে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিয়ের আশ্বাস দিয়ে, পরীক্ষায় ফেল করার ভয় দেখিয়ে, বড় বোনকে তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে, সহিংসতার মাধ্যমে।

কিন্তু শিশু এসব কথা বড়দের বলতে পারে না, কারণ অনেক সময় বড়রা শিশুদের কথা বিশ্বাস করতে চায় না এবং গুরুত্ব দেয় না। এছাড়াও শিশুদের রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারনার অভাব। যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে; ভালো আদর, খারাপ আদর এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে শিশুর ধারনা থাকে না। আর যদি বা কারো মধ্যে ধারনা থাকে তা খুবই সীমিত। আর এ সুযোগের ব্যবহার করে নির্যাতনকারী। সে তার নিজের মত করে শিশুকে প্ররোচিত করে এবং ঘটনা সম্পর্কে অন্যকে বলতে নিষেধ করে দেয়। প্রকাশের ভাষা জানা নেই এবং শিশুটি তার শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামও জানে না। মা বাবার শিশুদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন না। ফলে কোন শিশু তার গোপনাঙ্গে নির্যাতনের ঘটনা গোপন রাখতে বাধ্য হয়। সামাজিক কারণও এই বলতে না পারার পেছনে কাজ করে। শিশু জীবনের প্রতিটি বিষয় শিখে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে। নির্যাতনের শিকার অন্যশিশুর প্রতি নিজ মা-বাবার মন্তব্য বা আচরণ থেকে শিশুর মনোজগতে যে ধারনাটি বদ্ধমূল হয়, তাহলো যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি জানাজানি হলে সবাই তাকে দোষারোপ করবে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের সবাইকে এ সমাজ অপমান করবে। এ কারণে শিশু কাউকে বলতে পারে না। সে অপরাধবোধে ভোগে যে এই ঘটনার জন্য সে-ই দায়ী। তারপর রয়েছে নির্ভরতার অভাব। একবার হয়তো শিশুটি মা-বাবা অথবা পরিবারের কারো কাছে তার নির্যাতনের কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ তার কথার গুরুত্ব দেয়নি। অথবা অন্য যে কোন ঘটনার জন্য শিশুটির ধারনা হয় মা-বাবাকে সমস্যার কথা জানালে

তারা তাকে সহযোগিতা করবেন না। বরং শিশুটির দোষ দেবে। প্রাণ খুলে নির্ভয়ে কথা বলার জায়গা ন পেয়ে শিশু তার অনাকাঙ্খিত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলে না। সর্বাপেক্ষা যেকারণগুলো শিশুকে এ ঘটনা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করে, সেটি হলো তার মনের লজ্জা, অপরাধবোধ ও ভয়। অনেক সময় শিশু মনে করে ঘটনাটি মা-বাবা জানলে তারা শিশুটিকে মারতে পারে, লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে পারে। হয়ত বন্ধু-বান্ধব কারো সাথে তাকে মিশতে দেবে না। আগের মতো পরিবারের কেউ তাকে ভালবাসবে না। এই সমস্ত বিষয়ে সে ভীত থাকে। অনেক সময় মনে হতে পারে এই লজ্জার ঘটনা তার জীবনেই ঘটেছে। অন্য কারো জীবনে এমন ঘটনা বলতে না চাওয়ার পিছনে কিভাবে নির্যাতিত হয়েছে সেটিও একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। আবার নির্যাতিত ও নির্যাতনকারীর বয়সের পার্থক্যও একটি ব্যাপার।

যৌন নির্যাতনের ঘটনা একটি শিশুর মনোজগতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, কত গভীরভাবে শিশুকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এটা নির্ভর করে শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর। ঘটনাটি শিশু কিভাবে গ্রহণ করছে তার উপর নির্ভর করে মানসিক অবস্থা। যৌন নির্যাতনের ঘটনায় শিশুর মানসিক সমস্যা স্বল্পমেয়াদী হতে পারে আবার দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। এছাড়াও আরো কিছু বিষয়, যেমন : নির্যাতনের শিকার শিশুর পরিবার, সামাজিক প্রভাব, যৌন নির্যাতনের স্থায়ীত্ব/স্বরূপ, নির্যাতনকারীর সাথে নির্যাতিত শিশুর সম্পর্কের ধরণ, ঘটনার স্থান এসবের উপর নির্ভর করেও মানসিক সমস্যার তারতম্য হয়ে থাকে।

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানসিকভাবে। এ সময় শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সব ধরনের সহায়তার পাশাপাশি বিশেষভাবে প্রয়োজন মানসিক সহায়তা। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের নানারকম মানসিক সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন: উদ্বেগ, দুঃখবোধ, রাগ, অতিরিক্ত লজ্জা, অতিরিক্ত ভয়, নিম্ন আত্মধারণা, নিজেকে অপরাধী মনে করা, ক্ষমতাহীন মনে হওয়া, হতাশা, যৌন নির্যাতনের ঘটনা বিষয়ক ভীতি, আত্মহত্যা করার চেষ্টা, কান্না, অতি-চঞ্চলতা, অন্যদের এড়িয়ে চলার প্রবণতা, নিজেকে গুটিয়ে নেয়া, অবাধ্যতা এসব আচরণগত সমস্যাগুলো সাধারণভাবে দেখা যায়। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে যৌন বিষয়ক খেলাধূলা করে।

মানসিক বিষয়ের পাশাপাশি তাদের শারীরবৃত্তীয় সমস্যাও দেখা দিতে পারে। যেমন : ঘুমের সমস্যা, খাবারের অরুচি, চমকে উঠা, শরীরে ব্যথা, ঘুমের সময়ের পরিবর্তন হওয়া, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ইত্যাদি।

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের নানা রকমের নেতিবাচক চিন্তা তৈরি হয় যেমন : জীবন মূল্যহীন, আমি কোন কাজের না, আমার শরীরের কোন মূল্য নেই, কেউ আমাকে বোঝার চেষ্টা করে না, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সবাই আমাকে ঘৃণা করে, কেউ আমাকে বিয়ে করবে না, আমি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবো না, আমার কোন ক্ষমতা নেই, আমি শেষ হয়ে গেছি, কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না, আমি একজন খারাপ মানুষ, আমাকে কেউ গ্রহণ করবে না, ইত্যাদি।

বয়স ভেদে এসব সমস্যার তারতম্য হয়ে থাকে এবং সাধারণভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলো দেখা যায়। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য যা করা অত্যন্ত প্রয়োজন তাহলো – শারীরিক চিকিৎসা করানো, শিশুর কাউন্সেলিং ও পারিবারিক কাউন্সেলিং করা।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের জন্য মানসিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাদের যথাযথভাবে সহযোগিতা করতে হলে Holistic support অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত জরুরী। কিভাবে শিশুদের যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে অবহিত করা যেতে পারে তা নির্ণয় করা, কারণ একটি পরিবারের বড়দের পক্ষে শিশুদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার বিধান সম্ভব হয় না। কাজেই শিশুকে শিখতে হবে কিভাবে সে যৌন নির্যাতনকারীর হাত থেকে নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে পারবে।

শিশু যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সজাগ হওয়া প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। একটি শিশু কখনোই যেন যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় এবং কোন শিশুই যেন এই দুঃখজনক মানসিক আঘাত না পায়। সবাইকে সোচ্চার হতে হবে যাতে এই অপরাধ বন্ধ হয় এবং পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের কোন শিশুই যেন যৌন নির্যাতনের শিকার না হয়, এ বিষয়ে যেমন আমাদের সচেতন থাকতে হবে।